সম্পাদকীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ২৬ আষাঢ় ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ৫৪ সংখ্যা

স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হোক

রাজ্যের প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিক বাড়াল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে নতুন করে পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে পার্শ্বশিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে, তার ফলে শিক্ষার এই দুটি স্তরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও খানিকটা বাড়ল। এমনিতেই মামলা সহ একাধিক কারণে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগপর্ব স্থবির হয়ে রয়েছে। রাজ্যের নতুন সিদ্ধান্তে চাকরিপ্রার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত। রাজ্য সরকার খরচ কমানোর যে পরিকল্পনা করেছে, তার মধ্যে স্থায়ী নিয়োগকে যদি আংশিক অন্তর্ভুক্তও করা হয়, সেটাই বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এ রাজ্যে শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক কিন্তু অনেক রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা যা কিনা বুনিয়াদি শিক্ষার স্তর হিসাবেই পরিচিত, তাকে নিয়ে একটা সময় প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্ক তৈরি হয় প্রাথমিকস্তর থেকেই ইংরেজি না পড়ানো আর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল তুলে দেওয়া নিয়ে । পূর্বতন বাম আমলের এই দুটি সিদ্ধান্ত এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়ো ভুল, তা অনেকেই মেনেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, সেই দুটি ভুল স্বীকার করার পরেও বর্তমান সরকারের তরফে তা সংশোধনের উদ্যোগ গত সাত বছরেও তেমনভাবে দেখা যায়নি। সরাসরি খরচের প্রসঙ্গ তোলা না হলেও দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ সেভাবে হয়নি। একটা সময় প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রতি বছরই নিয়মিত হত। কিন্তু এখন তাও চূড়ান্ত অনিয়মিত। ওই পরীক্ষায় সফল হওয়ার পরেও নিয়োগপর্ব কোন অবস্থায় রয়েছে, তার নির্দিষ্ট হদিস থাকে না। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্কুলে নানা কারণে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বদলে গিয়েছে। বহু স্কুলে যেমন পড়ুয়ার সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি রয়েছে, তেমনই একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন এমন স্কুলের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, শিক্ষায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ শিক্ষাকেই বিঘ্নিত করছে। দেখা যায় কোনো কোনো শিক্ষক অতি সহজেই তাঁর পছন্দমতো স্কুলে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। বহু পুরানো শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে গ্রামাঞ্চলে, প্রত্যন্ত এলাকায় পড়ে থাকছেন। অন্যদিকে দেখা যায়, স্কুলের দৈনন্দিন খরচের হিসাব ধরলে বছরে যা খরচ হওয়ার কথা, তার তুলনায় বার্ষিক বরাদ্দ অনেক কম। তার মধ্যে মিড-ডে মিলের হিসাবও ধরা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, বরাদ্দ যদি কম হয়, তাহলে স্কুলগুলি সেই খরচের ঘাটতি সামাল দিচ্ছে কী করে। নিশ্চিতভাবে হয় খরচ করছে না কিংবা ঠিকমতো হিসাব দিচ্ছে না স্কুলগুলি।এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় রয়েছে। স্কুলে মূল কাজ অর্থাৎ শিক্ষাদানপর্বে অনেকাংশেই ঘাটতি রয়েছে। বিষয়টি হয়তো অনেকেই মানতে চাইবেন না, কিন্তু এটাই বাস্তব। আগে যেমন স্কুলগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করতেন শিক্ষাকর্তারা, এখন তাতেও ভাটা পড়েছে। বহু স্কুলে এমনও শিক্ষক রয়েছেন যিনি বা যাঁরা পড়ুয়াদের ভালো করে চেনেনেই না। কারণ তাঁর বা তাঁদের 'অন্য কাজের চাপে' ক্লাসে যাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের যা পরিকাঠামো এখন রয়েছে, তাতে বাস্তবিকই পড়াশোনার বিষয়টি বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছে। ইংরেজিমাধ্যমের বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে সরকারি স্কুল। তার উপর আর্থিক দায়ে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে যদি কোপ পড়ে, ভবিষ্যতে তার পরিণাম কতটা শুভ হবে তা নিয়ে বিতর্ক থাকবেই।

অমৃতধারা

অনেকেই ক্রোধকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। নম্রতার বর্ম পরিধান করো, নিরাপদ অনুভব করবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ বিশেষ পার্ট পালন করছে- এই বোধ থাকলে, সহনশীলতার শক্তি সহজেই আরও বাড়ানো যায়। যখন তোমার মনে হবে যে তোমাকে তো অনেক সহন করতে হবে, তার অর্থ তুমি এখনও সহন করার চেষ্টা করে যাচ্ছ। খ্যাতি ও যশে যদি আমি মদগর্বিত হই, তবে অপমান ও দুর্নাম আমাকে বিধ্বস্ত করবে। ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া এ দুটি জিনিসই আছে। ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম যদি সাধারণ স্তরেরও হয় প্রতিক্রিয়া যেন শুভ, ফলদায়ী ও সৃজনশীল হয়।

মনে বিশ্বাস ও জয়ের নেশা থাকলে সাফল্য অর্জন করা যায়। দুর্বল চিন্তা যেখানে, পরাজয় সেখানে। কোনো কিছুকেই বাধা মনে করবে না, মনে করবে তা যেন জয়ের পথের সোপান। তোমার নিয়ন্ত্রণশক্তি এরূপ হওয়া উচিত, যে মুহূর্তে যে চিন্তা তুমি করতে চাও সে চিন্তাই শুধু উদয় হবে, এর বেশি বা কম হবে না। বিগত দিনের অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, তার অনুভূতি এবং কার্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করো যাতে তার কণামাত্রও মনে উদয় না হয়। ভাষার 'কমা', 'ফুলস্টপ' আমরা জানি। কিন্তু ব্যর্থ চিন্তাপ্রবাহে আমরা 'ফুলস্টপ' দিতে জানি না।

প্রীতিপূর্ণ আদেশে কোনো বিরুদ্ধভাব জাগে না। ইহা আদেশকারীকে বড়ো করে তোলে। সমস্যার সমাধানের জন্য যত্নবান হও এবং এখনই সেটা করো। অজুহাতের দ্বারা বিলম্ব করো না। যার ভয় আছে সে নিজের প্রতি যেমন, অন্যের প্রতিও সমান বিপজ্জনক। ঈশ্বর যদি আমার পিতা, শিক্ষক ও গুরু হন তাহলে এই পৃথিবীতে আমার কীসের ভয় ?

-ব্রহ্মকুমারী

শব্দরঙ্গ ■ ২০৪৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি ঃ ২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়বিশেষ ৫। পুত্র ৬। হাতের সাহায্যে কঠিন কাজ সহজে করা, চুরির অভ্যাস ৮। কূল বা পাড় ৯। সেতার, বীণা ইত্যাদির মাথায় তার জড়ানো কাঠি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ১১। কর্মহীনদের জন্য ভাতা বা সরকারি অর্থসাহায্য ১৩। বাংলা বছরের একটি মাস ১৪। রঙ্গতামাসাপূর্ণ।

উপর-নীচ ঃ ১। পুলিশের ভাষায় মহিলা কেপমার যারা ২। বছর, অব্দ ৩। চাষবাসের জমি, চাষাবাদ ৪। শব্দ করে আকাশে উঠে যায় এমন আতশবাজি ৬। নির্দিষ্ট দিনে বসে এমন কেনাবেচার জায়গা ৭। ঠিকানা, বাসস্থান ৮। রেশমের মোটা সুতোয় বোনা কাপড় ৯। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি দড়ি ১০। মৌমাছি, ভ্রমর ১১। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ ১২। দাদা বা ভাইয়ের ছেলে ১৩। পাকানো সুতো, ঘড়ি, তাবিজ, ঘুনসি ইত্যাদি বাঁধার মোটা সুতো।

সমাধান ■ ২০৪৫

পাশাপাশি ঃ ১। কলকাতা ৩। তাফতা ৫। আকাশকুসুম ৬। তারানা ৭। ধাতব ৯। অনুজপ্রতিম ১২। দঙ্গল ১৩। রমরমা।

উপর-নীচ ঃ ১। কথকতা ২। তাড়কা ৩। তামাকু ৪। তামাম ৫। আনা ৭। ধাম ৮। বয়নামা ৯। অগদ ১০। জম্বুল ১১। তিতির।

স্বামীদের যেভাবে বশে রাখতেন দ্রৌপদী

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

যেদিন কৌরবসভায় দ্রৌপদীর চরম অপমান হয়েছিল, সেদিন দ্রৌপদীর লজ্জামিশ্রিত ক্রোধদৃষ্টিতে পাণ্ডবরা যত দুঃখিত হয়েছিলেন, এমনটা তাঁদের রাজ্যহরণ কিংবা ধনরত্নহরণেও হয়নি

স্বামীদের কী করে বশে রাখা যায়, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সত্যভামা। দ্রৌপদী বলেছেন, স্বামীদের মন্ত্র-তন্ত্র-ওষুধ করে বশ করার ব্যাপারটা 'ভালো মেয়ে'রা করে না। তা ছাড়া, এভাবে বশ করা যায়ও না স্বামীদের। এটাই দ্রৌপদীর মত। এবারে দ্রৌপদী জানাচ্ছেন যে, তিনি নিজে কী কী উপায়ে পাঁচ-পাঁচটা স্বামীকে বশে রেখেছেন। বস্তুত, এই সূত্রে দ্রৌপদী স্বামী-সেবার যে তালিকা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তৎকালীন পতিব্রতা রমণীর সমস্ত ইতিকর্তব্যই ধরা আছে। অর্থাৎ কিনা কীভাবে দ্রৌপদী স্বামীদের অহর্নিশ পরিচর্যা করেন, স্বামীরা ভাত না খেলে তিনিও ভাত খান না, দূর থেকে ফিরলে বসার আসন, পা ধোয়ার জল কীভাবে এগিয়ে দেন, বাসনপত্র, খাবারদাবার কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখেন—এসব গৃহকর্মনিপুণার সমস্ত কর্তব্যগুলো দ্রৌপদী উল্লেখ করে শেষে বলেছেন, আমি সবার আগে ঘুম থেকে উঠি এবং সকলের শেষে ঘুমাই।

হতেই পারে, দ্রৌপদী সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন এবং সবার পরে তিনি ঘুমোতে যেতেন। হয়তো এটাও ঠিক যে, পাঁচ স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জেরে বিরোধী জ্ঞাতিগোষ্ঠীর রাজনীতি যেভাবে তাঁর ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল, তাতে তাঁর দিন-রাত এক হয়ে গিয়েছিল ব্যস্ততায়, কিন্তু সে কথাও তিনি এখানে উচ্চারণ করেছেন এমনই এক পাতিব্রত্য-ভাবনায়, এমনই এক সেবা-শুশ্রূষার বৃত্তিতে, যেখানে আমাদের চেনা 'কাশ্মীরি ঘোটকী'র মতো দ্রৌপদী একেবারে অচেনা হয়ে যান। মহাভারতের অন্যত্র তো বটেই এবং বহু পুরাণের মধ্যে স্বামী-বশংবদতা এবং পতিব্রতা-ধর্মের প্রণালী নিয়ে যত উপদেশাত্মক অংশ আছে তার সবটুকু যেন দ্রৌপদী এখানে উদ্ধার করে এনেছেন। হয়তো দ্রৌপদীর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই সেটা মেলে না বলেই পণ্ডিতরা অনেকেই মতপ্রকাশ করেছেন যে, দ্রৌপদী-সত্যভামার এই কথোপকথনের অংশটুকু নির্ভেজাল একটা প্রক্ষেপ। দ্রৌপদীর উপদেশখণ্ডটুকু 'প্রক্ষিপ্ত' মনে হচ্ছে এই কারণে যে, সারা মহাভারত জুড়ে দ্রৌপদীর কথাবার্তার যে ধরন আমরা দেখেছি, তাঁর যে বৈদগ্ধ্যভঙ্গি দেখেছি, 'কাশ্মীরি তুরঙ্গী'র মতো তাঁর যে দাপট দেখেছি, তার সঙ্গে দ্রৌপদীর এই নম্র, বিনয়ী, শত-প্রহারে স্পন্দহীন আনুগত্য আর পাতিব্রত্যের উপদেশ মেলে না, খাপ খায় না। অতএব এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। দেখবেন, প্রক্ষেপ যেখানেই ঘটেছে, সেখান প্রায় ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের কথাগুলো যেন প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। তবু বলছি, দ্রৌপদীর এই উপদেশ বা পাতিব্রত্যের অনুশাসন, যা দিয়ে স্বামী-পুরুষদের বশে রাখা যায় বলে তিনি বলেছেন—এর মধ্যে একটা মহাকাব্যিক সংকেত আছে, আর ব্যাসের মতো অসামান্য মহাকাব্যের কবি সেটা বোঝেন বলেইদ্রৌপদীর মুখে যেন তাঁর চরিত্রের বিপরীত ভাষণটুকু বসিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুত, তার একটা কারণ হয়তো কবির মনোভূমিতেই আছে। খেয়াল রাখতে হবে, কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা, যিনি চারিত্রিক বিশ্লেষণে দ্রৌপদীর সার্থক-ছায়া হতে পারেন, তিনি পঞ্চস্বামীগর্বিতাদ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেছেন যে, স্বামীদের তিনি বশে রাখেন কী করে? এর উত্তর, দ্রৌপদী যদি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে কীভাবে তিনি স্বামীদের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারের বর্ণনা দিতেন, বশীকরণের উপায় হিসাবে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন, তার মধ্যে একটি-দুটি ছাড়া আর একটাও তিনি করেছেন বলে মনে হয় না। তা হলে প্রশ্ন, এইরকম উপদেশমূলক পাতিব্রত্যের অনুশাসন তিনি উচ্চারণ করলেন কেন?

আমাদের মতে, এইখানেই ব্যাসের মতো বিশালবুদ্ধি মহাকবির মহাকাব্যিক অভিসন্ধি কাজ করে। এটা বোঝা দরকার যে, দ্রৌপদী এখানে যে কথাগুলো স্বামী-বশীকরণের সমাধান হিসাবে বলবেন, সেগুলো কিন্তু সমস্ত স্ত্রীজনের পালনীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, মহাভারতের 'ডাইডাকটিভ' জায়গাগুলোর মধ্যে এমন অনুশাসন-উপদেশ অনেক আছে, যেগুলো পরে ধর্মশাস্ত্রের উপদেশের পালনীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। কাজেই উপদেশের ক্ষেত্রে অতি বড়ো মানুষকেও শাস্ত্রীয় ভাবনায় চলতে হয়। ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলে সেটা সাধারণের উপযোগী হয় না, অতএব তখন দ্বিচারিতাই করতে হয়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি।

যে ভালোমানুষের ছেলে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হল, সে যেখন একটি বিশেষ প্রকাশনার বিজ্ঞাপনে হাতে একখানা বই নিয়ে বলে, এই প্রকাশনার বই এবং তাদের উপমন্ত্রিত পরামর্শ শুনেই আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি, তখন বুঝবেন, সেটা সর্বৈব মিথ্যা কথা অর্থাৎ দ্বিচারিতা। কিন্তু ওই বিজ্ঞাপন দেখে যে গোমূর্খরা ওই বইটি পড়বে, সেই সাধারণ্যে কিন্তু সেই বই উপযুক্ত হতেই পারে। একইভাবে একটি অতি মেধাবী অতিস্মৃতিমান ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি দিনে ক-ঘণ্টা পড়ে এত ভালো রেজাল্ট করলে, তখন যদি সে বলে আড়াই ঘণ্টা দিনে পড়লেই হয়ে যায়, তখন সেটা সত্য হতেও পারে। কিন্তু এই উদাহরণ অনুসরণ করে যদি এক সাধারণ ছেলে আড়াই ঘণ্টা পড়ে পরীক্ষায় ফেল করে, তখন আপনি কোন ছেলেটাকে দুষবেন—সেই ছেলেটাকে, না কি নিজের ছেলেকে?

বস্তুত উপদেশ দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষেত্রে উপদেষ্টা এবং উপদেশের পাত্র ভীষণই জরুরি। আমাদের বৈষ্ণব দর্শনের মহান তাত্ত্বিকরা বহিরঙ্গে খানিক নিয়মবিহীন, শৃঙ্খলিত আচার-ব্যবহারের বাইরে থাকা দু-চারজন 'নিত্যসিদ্ধ গুরু'-র কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দ্যাখো বাবা, শাস্ত্র-আচার-সমন্বিত সাধুদের সঙ্গ করো সব সময়, এই যে অতি তেজস্বী সাধু-গুরুরা আছেন, তাঁদের সেবা করো, কিন্তু সঙ্গ করার জন্য তাঁরা মোটেই উপাদেয় নন। সত্যি বলতে কী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বহুল কোনো উপদেশ দেননি, কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর অনুসারী জনকে যত উপদেশ এবং 'মাস লেকচার' দিয়েছেন, তা তাঁর প্রথম জীবনের যাপন-পদ্ধতির সঙ্গে এতটুকুও মিলবে না।

এবারে জানাই, দ্রৌপদীও নিজের জীবনে আপন বৈদগ্ধীতে স্বামীদের সঙ্গে যেভাবে চলেছেন, সেগুলো যদি স্বামীকে বশে রাখার উপদেশ হিসাবে আসত, তা হলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংসারে আগুন লেগে যেত। কাজেই উপদেশের জায়গায় উপদেশটা চিরাচরিত পিষ্টপেষকই হয়। কোনো ক্লাস টেনের ছেলেকে মা-বাবা বলবেন না যে, বাছা তোমার মাথায় তো অসাধারণ বুদ্ধি, তুমি বইতে চোখ বোলালেই প্রথম হবে। মা-বাবা তাকে গাধার খাটনি খেটে পড়াশোনা করতে বলবেন। দ্রৌপদীও ঠিক তাই করেছেন। নইলে দেখুন, এই যে দ্রৌপদী বললেন, আমি আমার স্বামীদের কটুকথার ভয় পেয়ে চলেছি, তাঁদের ক্রোধদৃষ্টি দেখলে আমার দুশ্চিন্তা হয়েছে। সত্যি বলতে কী, দ্রৌপদী স্বামীদের ক্রোধরক্ত দৃষ্টি দেখে কোথাও ভয় পাচ্ছেন, এমনটা মহাভারতে দেখিনি, আর পাণ্ডব-পঞ্চকের একজনেরও এই সুযোগ আসেনি যাতে দ্রৌপদীর দিকে সক্রোধে তাকাতে হয়। বরঞ্চ উলটো উদাহরণ দিয়ে বলি, যেদিন কৌরবসভায়দ্রৌপদীর চরম অপমান হয়েছিল, সেদিন দ্রৌপদীর লজ্জামিশ্রিত ক্রোধদৃষ্টিতে পাণ্ডবরা যত দুঃখিত হয়েছিলেন, এমনটা তাঁদের রাজ্যহরণ কিংবা ধনরত্নহরণেও হয়নি।

দ্রৌপদী বলেছেন, তিনি বাসনপত্র পরিষ্কার রাখেন, খাবারদাবার গুছিয়ে রাখেন, খিদে পেলেই খেতে দেন। আমাদের জিজ্ঞাসা, রাজবাড়ির দাস-দাসী তা হলে কী করত? আমরা জানি, পাণ্ডবদের বনবাসকালেও বহু পরিচারক-পরিচারিকা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর সূর্যমার্কা থালা নিয়ে রান্না আরম্ভ করতেন হয়তো, হয়তো বা খেতেনও সবার পরে, কিন্তু সকলের রান্না তাঁকেই করতে হত, এই বিশেষ খবর মহাভারতে নেই। আসলে উপদেশ উপদেশই, যা সাধারণ্যে প্রণিধানযোগ্য। ধরা যাক, মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে আরও অনেক ব্যবহারিক শাস্ত্রে মেয়েদের সঠিক সুরক্ষার স্বার্থে এই উপদেশটা দেওয়া হয়েছে যে, মেয়েরা যেন যখন-তখন হাসাহাসি না করে, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ইতিউতি না-তাকায় বেশি, কিংবা কোনো গোপন জায়গায় না যায়, গৃহসন্নিহিত উদ্যানেও যেন বেশি সময় না কাটায়।

এখন এসব কথা বোকা বোকা মনে হলেও আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও মায়েরা মেয়েদের এই কথাগুলো বলতেন, এটা বিয়ে বাড়িতে গেলে পর্যন্ত বয়স্থা মেয়েকে হট্টমালার ঘরে শুতে দিতেন না। কিন্তু বিবাহিত দ্রৌপদীর কী সমস্যা? হ্যাঁ, সেকালের এক গৃহবধূ বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির দরজায় ইতিউতি তাকাচ্ছে, কিংবা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনটা হত না। কিন্তু দ্রৌপদী পরিহাসের কাল ছাড়া হাসছেন না, কিংবা বিনা কারণে দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না—এমনটা আমরা দেখিনি। এই যে কী সুন্দর সংযম-মধুর উপদেশ দিচ্ছেন দ্রৌপদী, এই বনবাস পর্বের শেষের দিকেই দেখব, পাণ্ডবরা খাবার ব্যবস্থা করার জন্য মৃগয়া করতে গিয়েছেন। ওদিকে দুর্যোধনের জামাই রাজা জয়দ্রথ ঘরে দুঃশলা স্ত্রীকে রেখে নতুন একটা বিয়ের তাড়নায় সাঙ্গপাঙ্গ-সহ বেরিয়েছেন, আর ঠিক তক্ষুনি দ্রৌপদীকে দেখা গিয়েছে। তিনি ঘরের সামনে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দু-হাত উঁচু করে কদমগাছের ডাল নোয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

জয়দ্রথ অন্যায় লাম্পট্য নিয়ে পথ চলছিলেন, তাঁর কথা বুঝি। তিনি দূর থেকে লক্ষও করেছিলেন 'অনবদ্যাঙ্গী' দ্রৌপদীকে। কিন্তু এই সুন্দরী অরণ্যভূমির মধ্যে, বিশেষত তাঁর পাঁচ স্বামীই যখন ঘরে নেই, সেখানে এই খ্যাপা হাওয়ায় কুটির দুয়ারে দ্রৌপদীর দাঁড়িয়ে থাকার কী প্রয়োজন ছিল, যেখানে তিনি নিজেই উপদেশ দিচ্ছেন, কুটির দুয়ারে আমি কখনও ঘুরে বেড়াই না। আরও কথা, দ্রৌপদী তাঁর স্ত্রীজনোচিত তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, রাজপুরুষরা তাঁকে দূর থেকে দেখেছেন, জয়দ্রথের এক বন্ধু এক মধুর প্রস্তাব নিয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন, কিন্তু দ্রৌপদী তাঁকে দেখেও কুটির দুয়ারের কদমগাছখানির একটি অবাধ্য ডাল নোয়ানোর চেষ্টা করছিলেন কেন? দ্রৌপদী কী বুঝতে পারছিলেন না যে, এই শাখা নোয়ানোর আয়াসে-প্রয়াসে তাঁর মুহুর্মুহু আন্দোলিত শরীরে, এবং অনুকূল পবনে তাঁকে আরও মোহিনী, আরও সুন্দরী লাগছিল। আমরা বলব, এই ব্যবহার কী তাঁর পতিবশীকরণের উপদেশের সঙ্গে এতটুকুও মেলে? এর ফল যে খারাপ হচ্ছিল, তা মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং মুহূর্তের মধ্যে গাছের ডাল ছেড়ে তাঁকে উত্তমাঙ্গের বসনখানি টেনেটুনে সুস্থিত করতে হয়েছে।

দ্রৌপদীর মতো এক বিদগ্ধা রমণী, মহাকবির বর্ণনায় যিনি 'প্রিয়া চ দর্শনীয়া পণ্ডিতা চ পতিব্রতা'—সেই দ্রৌপদীর ব্যক্তি-জীবনের পাতিব্রত্যের সংজ্ঞা যদি তাঁর উপদেশের মধ্যে মিশে যায়, তা হলে সাধারণ্যে তাঁর ধারণশক্তি থাকবে না বলেই দ্রৌপদী পরম্পরাবাহিত পাতিব্রত্যের উপদেশ দিয়ে সত্যভামাকে বলেন, এইভাবেই আমি আমার স্বামীদের বশে রাখি, এইগুলোই আমার বশীকরণের উপায়। এতক্ষণ ধরে দ্রৌপদীর মুখে এই চিরাচরিত উপদেশ শুনে কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা বললেন, আমি সব বুঝেছি। আমাকে ক্ষমা করো যাজ্ঞসেনী!

কেননা, সখী-বন্ধুদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ তো উপহাসের মাধ্যমেই হয়। তার মানে কী এটাই বুঝব যে, সত্যভামা এতক্ষণ ধরে দ্রৌপদীর মুখে যা শুনেছেন তা তাঁর কাছে উপহাসের মতো লেগেছে। বস্তুত, এখানে বক্তা দ্রৌপদী, শ্রোতা আরেক বিদগ্ধা নায়িকা সত্যভামা, কাজেই উপদেশগুলো বঙ্কিমের ভাষায়, অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলাম, কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলাম।

সারা মহাভারত জুড়ে দ্রৌপদীর কথাবার্তার যে ধরন আমরা দেখেছি, তাঁর যে বৈদগ্ধ্যভঙ্গি দেখেছি, 'কাশ্মীরি তুরঙ্গী'র মতো তাঁর যে দাপট দেখেছি, তার সঙ্গে দ্রৌপদীর এই নম্র, বিনয়ী, শত-প্রহারে স্পন্দহীন আনুগত্য আর পাতিব্রত্যের উপদেশ মেলে না, খাপ খায় না

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

স্বপ্নপূরণ

গত ৩ জুলাই প্রকাশিত 'মেধাবী রবির স্বপ্নপূরণে পাশে দাঁড়ালেন বিডিও' শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে বলছি, উচ্চমাধ্যমিকে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়েও আর্থিক সামর্থ্য না থাকার জন্য রবি কলেজে ভরতি হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। মাতৃ-পিতৃহীন উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া হাইস্কুলের এই ছেলেটির পাশে দাঁড়ালেন চাকুলিয়া ব্লকের বিডিও সুপ্রিম দাস। রবির কলেজে ভরতি হওয়া থেকে সমস্ত পড়াশোনার খরচ বহন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি এবং তাঁরই সাহায্যে রবি রায়গঞ্জ কলেজে ভরতি হয়েছে।

এই রকম একজন মেধাবী ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে সুপ্রিমবাবু মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই জন্য সুপ্রিমবাবুকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রবি আগামী দিনে আরও উন্নতি করবে-এই আশায় রইলাম। অর্থের জন্য কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা হবে না- এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। চেষ্টা থাকলে তার স্বপ্ন পূরণে ভগবানরূপী মানুষ তার পাশে ঠিকই দাঁড়ান। শুধু ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। চেষ্টা করলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবেই। তাই সমস্ত শিক্ষার্থীর কাছে আমার আবেদন, তোমরা চেষ্টা করে যাও। তোমাদের স্বপ্নপূরণ ঠিকই হবে।

আরতি দাস
মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি।

ওঝার বোঝা অজ্ঞতার মতো চেপে বসেছে সমাজের ঘাড়ে

সম্প্রতি সংবাদ সূত্রে জানতে পারলাম পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহব্বতপুর হালনা গ্রামের বাসিন্দা আসাদুল্লা শেখ (৩২) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী তাকে হাসপাতালে ভরতি না করে কোনো এক ওঝাকে দেখায়। ওঝা কয়েকদিন ধরে তার ওপর ভূত তাড়ানোর নানান কেরামতি চালায়। আসাদুল্লার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তার পরিবারের লোকজন শেষপর্যন্ত তাকে হাসপাতালে ভরতি করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। শেষে আসাদুল্লার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, ভারতে মনুষ্য রোগ, রোগের কারণ, প্রতিকার ও ওঝার বুজরুকি সংবলিত একটি অতিরিক্ত বিষয় নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে থাকলে, প্রকৃত বিজ্ঞান পাঠের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। যেমন- (১) জন্ডিস হলে মানুষ এখনও ওঝার কাছে যায়। ওঝা মালা পরিয়ে জন্ডিস ঝাড়ে। পাঠ্যবইটিতে জন্ডিস ও জন্ডিস নিয়ে ওঝার বুজরুকির সঠিক ব্যাখ্যা থাকলে মানুষের ওঝার কাছে যাওয়া বন্ধ হবে।

(২) কুকুরে কামড়ালে মানুষ এখনও ওঝার কাছে যায়। ওঝা পিঠে থালা বসায়। উক্ত বইটিতে জলাতঙ্ক রোগ ও থালা বসানোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মানুষকে সচেতন করত।

(৩) সাপে কাটলে মানুষ ওঝার কাছে যায়। সাপ, সাপের বিষ, ওঝার বুজরুকি নিয়ে ব্যাখ্যা পাঠে মানুষ ওঝার কাছে যাওয়া বন্ধ করত।

(৪) ডাইনি সন্দেহে হত্যার পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রহস্য লুকিয়ে থাকে সেই রহস্য (যাদের ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিকট আত্মীয়রা চক্রান্ত চালিয়ে তাদের হত্যা করে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করার চেষ্টা চালায়) মোচন বা উদ্‌ঘাটন সংবলিত ব্যাখ্যা পাঠ্যসূচিতে থাকলে ডাইনি সন্দেহে হত্যার প্রবণতা হ্রাস পেত।

(৫) ভূতে ধরা (ভূতে তো ধরে না, একপ্রকার বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে) রোগীকে দু-চার জন মিলে সামলাতে কিছুটা হিমসিম খেতে হয়। ওঝার কাছে নিয়ে গেলে ওঝা সাত-আট জন লোকের দ্বারা রোগীকে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে চুলের মুঠি ধরে পেছনের দিকে টেনে দুচোখের পাতা আঙুল দিয়ে জোর করে খুলে ফোটা ফোটা সরসের তেল রোগীর চোখে দেয়। ঘাড়ে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় রোগী তখন ব্যথায় শক্তি হারিয়ে দেহ ছেড়ে দেয়। পরমুহূর্তে কিংবা দিন-দুয়েক বাদে রোগীকে দেখা যায় একই মূর্তি ধারণ করতে এবং ওঝাকেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে।

এই ধরনের রোগীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারবাবুরা একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। সঙ্গে সেলাইন চালিয়ে দেন। রোগীর যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখা যায় রোগী প্রায় ৯০ শতাংশ সুস্থ। তারপর দেখা যায় ডাক্তারবাবুরা রোগীকে দু-এক দিন হাসপাতালে ভরতি রেখে পুরোপুরি সুস্থ করে ছুটি দিয়ে দেন।

পাঠসূচিতে এই রোগের কারণ ও ওঝার বুজরুকি সম্পর্কিত কিছু ব্যাখ্যা থাকলে ভূতে ধরা রোগীকে নিয়ে মানুষ ওঝার কাছে দৌড়াত না।

দেবব্রত ঘোষ
৩নম্বর ওয়ার্ড, মাদারিহাট।

বেহাল জলনিকাশি ব্যবস্থা ইসলামপুরে, পদক্ষেপ নিন

ইসলামপুর শহরে জলেনিকাশি ব্যবস্থা বহুদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এমনিতেই শহরে যে নর্দমাগুলি রয়েছে সেগুলি সারা বছর নোংরা আবর্জনা ও জলে পূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে মাঝেমাঝেই পুরসভার তরফ থেকে নর্দমাগুলি থেকে নোংরা আবর্জনা তোলা হয়। কিন্তু নর্দমাগুলিতে নোংরা জল থেকেই যায়। বর্ষার সময় এই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর কারণ হল শহরের নর্দমাগুলির জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষার জলে নর্দমাগুলি পরিপূর্ণ হয়ে সেই নোংরা জল রাস্তার উপরে চলে আসে।নর্দমার যত নোংরা আবর্জনা সেই রাস্তার জলের উপর ভেসে বেড়ায়। ওই জল ডিঙিয়ে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। ইসলামপুরে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে এই সমস্যা দেখা দেয়।

বর্ষাকালে রাস্তায় যেখানে সেখানে জল জমে থাকে। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও সেই জল জমা হয়ে থাকে। পথচলতি মানুষদের চরম অসুবিধার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এই সমস্যা ইসলামপুরে দীর্ঘদিনের। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হলে পুরাতনপল্লি, জীবনমোড়, দুর্গানগর কলোনি, ছৌসিয়া, শান্তিনগর ইত্যাদি এলাকায় রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। বহু মানুষের ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করে, এবং বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায় সেই জল নামতে। সামান্য বৃষ্টিতেই ইসলামপুর কোর্ট ও ফায়ার ব্রিগেডের সামনে পাকা রাস্তায় জল জমে যায়। এই সমস্যার কথা ইসলামপুর পুর কর্তৃপক্ষের গোচরে থাকা সত্ত্বেও সমাধানের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। আমি মাননীয় পুরপিতার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, অবিলম্বে এই গুরুতর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এই সমস্যার সমাধান হলে নিঃসন্দেহে ইসলামপুরবাসী ভীষণ উপকৃত হবেন।

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিলনপল্লি, ইসলামপুর।

জলসংকট সিমলায়

শৈলশহর সিমলা আজ অস্তিত্বের সংকটে। প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরুতে হিমাচল প্রদেশের রাজধানীতে ভিড় জমান ভ্রমণপিপাসুরা। এবার তীব্র জলসংকটে ভুগেছে এই পার্বত্য শহর। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের তাই কাতর আর্জি- 'সিমলা আসা বন্ধ করুন।' প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় গড়ে প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার পর্যটক আসেন সিমলায় ছুটি কাটাতে। পর্যটকরা তো তাও জল কিনে খেতে পারছেন। কিন্তু এখানকার প্রায় ২.২ লাখ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষের সমস্যা গুরুতর। অতিরিক্ত যানবাহনের ধকলে পরিবেশ সেখানে বিষাক্ত। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের লোভের জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সুন্দর শহরটির। তার খেসারত দিতে হচ্ছে চড়া দামেই। ঐতিহ্যবাহী সিমলার গ্রীষ্মকালীন উৎসব এবছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফ থেকে। সিমলাতে মূল জলের জোগান দেয় পাঁচটি উৎস। যা হল- গুমা, গিরি, অশ্বিনী খাদ, চুরাট, সেওগা। এরফলে প্রতিদিন ৬৫ মিলিয়ন লিটার জল পাওয়ার কথা আর চাহিদা ৪৫ মিলিয়ন লিটার/প্রতিদিন। কিন্তু ২০১৫ সালে অশ্বিনী খাদের প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায় জন্ডিস রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে। আর এই মুহূর্তে জল পাওয়া যায় ১৮.৫ মিলিয়ন লিটার/প্রতিদিন। পাইপলাইনে লিকেজ ও জলের অপচয়ের ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠছে দিনদিন।

সৈকত রানা, কলকাতা।

অচল টেলিফোন

দীর্ঘ দেড়মাস ধরে আমার ল্যান্ডলাইন টেলিফোনটি বিকল হয়ে আছে। কাস্টমার কেয়ারে বারবার অভিযোগ জানিয়েও টেলিফোনটি আজ অব্দি সচল করা গেল না বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার কারণে। এমনিতেই বিএসএনএলের মোবাইল পরিসেবা ও ল্যান্ডলাইন পরিসেবা নিয়ে গ্রাহকদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে গ্রাহকদের এই অসন্তুষ্টির কারণগুলো আজও কর্তৃপক্ষ তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন না। ফলে অনেক ল্যান্ডলাইন গ্রাহকই তাঁদের ল্যান্ডলাইন পরিসেবা সারেন্ডার করে অন্য বেসরকারি পরিসেবার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। অনুরোধ, আমার অচল টেলিফোনটি সত্বর সচল করে আমার যোগাযোগ ব্যবস্থাটি চালু করার ব্যবস্থা করুন। আমার ফোনটির নম্বর হল ২৭৬৩৭০।

প্রণীতা সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।